যুগান্তর
তারিখ 23 JAN 2016 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

মো. সিদ্দিকুর রহমান

যেভাবে শিশুরা বিকশিত হতে পারে

আজকের শিশুরাই হবে আগামী প্রজন্মের মহানায়ক। আমাদের শিশুরা অনেক বড় হবে। উত্তর প্রজন্মের জন্য এ স্বপ্ন কমবেশি সবাই দেখে। স্বপ্নের পিছু ছুটতে গিয়ে আমরা বোধহয় ভুলে যাই ছোট্ট সোনামণিরা আমাদের মতোই মানুষ। অবুঝ শিশু অবুঝ প্রাণীর মতো অরক্ষিত, নির্ভরশীল। তাদের চলমান পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। আমরা যারা শিক্ষিত বলে নিজেদের দাবি করি, তারা মনে করি, শিশুদের লেখাপড়া শেখানো কী এমন কঠিন কাজ! তাদের একটু গভীরভাবে ভাবতে বলব। বাড়িতে একটি ছোট শিশু থাকলে কতজন তার দেখাশোনা করে। দুর্ঘটনামুক্ত রাখার জন্য অনেকের দৃষ্টি থাকে তার দিকে। শিশু জন্মের পর প্রথমে কান্নার মাধ্যমে তার চাওয়া-পাওয়া, দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করে। আবার হাত-পা নেড়ে হাসিমুখে তার তৃপ্তির আনন্দ প্রকাশ করে। এ কান্না বা চাহনির মাধ্যমে মা শিশুর আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা ইত্যাদি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা নেয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু প্রথমে কাছের মানুষের সঙ্গে শব্দের মিল করতে শেখে; মা-বাবা ডাকতে শেখে। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অজ্ঞতার কারণে এ সময় শিশুদের ওপর নেমে আসে নির্যাতন। অভিভাবকদের বলতে শোনা যায়, শাসন না করলে কি শিশুরা বড় হয়ে মানুষ হবে? খাওয়া নিয়েও নেমে আসে নির্যাতন। শিশুর ক্ষুধা নেই, খাবার সামনে আনলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অনেক সময় একই খাবার খেতে খেতে বিরক্ত প্রকাশ করে, জোর করে খাওয়ালে বমি করে বা খাবার ফেলে দেয়, তবুও মেরে মেরে খাওয়ানো হয়। অভিভাবকদের বলতে শোনা যায়, 'খা, খাবি না কেন? এত কম খেলে কেমনে বড় হবি?' আমরা বড়রা বুঝতে চাই না, শিশুর খাবারের থলি কত বড়। ফলে শিশুর জেদ বাড়তে থাকে। ক্রমান্বয়ে সে হয়ে ওঠে জেদি। অনেক স্বাভাবিক বা ভালো কথা, ভালো আচরণ নিয়েও সে জেদ করে। অনেক সময় হিংস্র রূপ ধারণ করে ভাঙচুর করে। আমরা তাকে বেয়াদব বা খারাপ বলে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে আরও হিংস্র বা অস্বাভাবিক করে তুলি। কেন শিশু-এমন হল, নিজেদের কোনো দোষ না দেখে যত দোষ নন্দ ঘোষের ওপর চাপাই। শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বয়স হওয়ার আগেই পড়াশোনার জন্য অভিভাবকদের সীমাহীন ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হয়। শুরু হয় বাংলা, ইংরেজি, বর্ণমালা, সংখ্যা শেখানো ও লেখানোর তোড়জোড়। শিশুর হাতের লেখা স্পষ্ট হতে শুরু হয় সাধারণত পাঁচ বছর বয়স থেকে। শিশুর প্রথম পাঠ বর্ণমালা হওয়ায় সে লেখাপড়ায় আনন্দ অনুভব করে না। ফলে লেখাপড়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। দুই বছরের শিশু প্রথমে ধীরে ধীরে বিভিন্ন বস্তুর নাম বলবে। অনেক সময় নাম না বলতে পারলেও কিছু জিনিস চিনতে শেখে। অভিভাবকদের ফরমায়েশ পালনের মাধ্যমে অনেক জিনিস চিনতে ও নাম বলতে শেখে। তিন বছরের শিশুর ক্ষেত্রে ছোট ছড়া, গান, অভিনয় ও আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা শুরু করতে হবে। এ বয়সে শিশুরা রঙিন ছবিযুক্ত বই নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসে। ছবি দেখিয়ে পরিচিত জিনিসের নাম সম্পর্কে ধারণা দেয়া যায়। চারপাশের পরিবেশের বাস্তব জিনিস দেখিয়ে ধারণা দিতে হবে। পরিবেশের রঙ, ফুল-ফল, গাছ, তরকারি, ঘরের আসবাব, দৈনন্দিন সামগ্রীর নাম শেখানো যেতে পারে।

চার বছরের শিশুকে মা-বাবা ও আত্মীয়স্বজনের নাম, বাসস্থানের অবস্থান, আশপাশের এলাকার নাম শেখাতে হবে। নিজের হাতে খাওয়ার কৌশল, নিরাপদ থাকা, খোলা বা বাসি খাবারের খারাপ দিক সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। আগুন, পানি, বিদ্যুৎ, ধারালো বস্তু, ধুলাবালি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। রাস্তায় চলাচলের নিয়ম সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। খাওয়া, গল্প, খেলা কিংবা বেড়াতে যাওয়ার সময় শিশুকে ফল-ফুল, মাছ-তরকারিসহ বিভিন্ন জিনিসের নাম ও ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। কোনো কিছুর নাম মুখস্থ না করিয়ে ছবি দেখিয়ে শেখাতে হবে। দৈনন্দিন ছোটখাটো ফরমায়েশ আদর বা অনুরোধের সুরে করতে হবে। শিশুকে বেশি বেশি কার্টুন, গল্প, ছড়া, কবিতা, অভিনয় ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে শেখাতে হবে। শিশু যা কিছু পারে তা-ই আঁকবে। এ আঁকার মাধ্যমে সহজ

চার বছরের শিশুকে মা-বাবা ও আত্মীয়স্বজনের নাম, বাসস্থানের অবস্থান, আশপাশের এলাকার নাম শেখাতে হবে। নিজের হাতে খাওয়ার কৌশল, নিরাপদ থাকা, খোলা বা বাসি খাবারের খারাপ দিক সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। আগুন, পানি, বিদ্যুৎ, ধারালো বস্তু, ধুলাবালি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। রাস্তায় চলাচলের নিয়ম সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।

বর্ণগুলো লিখতে সাহায্য করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ধারাবাহিকভাবে ক, খ, গ বা অ, আ, ই নয়। যেমন সোজা দাগের মাধ্যমে শিশুকে প্রথম 'া' শেখাতে পারি। দাগের সাহায্যে ত্রিভুজ আঁকা শিখিয়ে ব, র, ক লেখাতে পারি। পর্যায়ক্রমে বাবা, কাকা ইত্যাদি শব্দ শিশুকে বানান করে শেখাতে বা লেখাতে পারি। এভাবে আঁকার মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণ ও শব্দ শেখাতে পারি। জোর করে লেখানোর প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শিশু পরিবেশের যত বেশি বস্তু বা জিনিস সম্পর্কে জানবে, সে শিশু তত বেশি জ্ঞানার্জন করবে। শিশুর কলম ধরা বা হাতের সঞ্চালন ক্ষমতার বয়স যখন হবে, তখন দেখবেন সে সহজে দেখে দেখে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, ইংরেজি বর্ণমালা লিখে ফেলবে। লেখাপড়া শিশুর কাছে আনন্দদায়ক করার জন্য চাপমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। শিশুকে অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে রেখে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য স্বাধীন চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে। এ বয়সে শিশু সবকিছু পারিবারিক পরিবেশ থেকে শেখে। এজন্য অভিভাবকদের খারাপ অভ্যাসগুলো বর্জন করতে হবে। শিশুরা যে কোনো বিষয়ে কৌতূহলপ্রিয়। যে কোনো বিষয় তারা নিজেরাই দেখতে, ধরতে ও শুনতে পছন্দ করে। এসব ক্ষেত্রে শিশুদের যদি উৎসাহ দেয়া যায়, তবে তার নিজস্ব জ্ঞানের পরিধি বাড়ে। যেমন— বাহবা দেয়া, তালি দেয়া, প্রশংসামূলক বাক্য বলা। এতে শিশুদের স্বাধীন ও মুক্তচিন্তা প্রকাশের সুযোগ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত শিশুরা যে কোনো ছন্দ সহজেই মনে রাখতে পারে। তাই ভালো লাগার জন্য ছন্দের সুরে, তালে তালে তাদের সহজেই যে কোনো বিষয় জানানো সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে শিশুদের নৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে বাস্তবতার আলোকে জানানো যায়। যেমন— বড়দের সালাম দেয়া, কিছু না বলে অন্যের জিনিস না ধরা, কুশল বিনিময় করা, সদা সত্য বলা, জায়গামতো জিনিস গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের অভিভাবকরা নামিদামি বিদ্যালয়ের শিশু মনোবিজ্ঞানবহির্ভূত প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের কাছে সন্তানদের পড়তে দিয়ে অহংকার বোধ করে। এ মানসিকতা মোটেও কাম্য নয়। সব কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে। 'মনোবিজ্ঞান ছাড়া শিক্ষা, ছিদ্র তলিতে ভিক্ষা' প্রবাদের মতো। একটি জরিপে দেখা গেছে, শতকরা ৮০ জন অভিভাবকের মনে বদ্ধমূল ধারণা, শিশুদের লেখাপড়া ও নিয়মকানুন শেখাতে তাদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তির বিকল্প নেই। এ শাস্তি যে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত করে, তা তারা জানেন না। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক তাজুল ইসলামের মতে, তিন-চার বছর থেকে শিশুদের মধ্যে স্বাধীনচেতা মনোভাব তৈরি হতে শুরু হয়। তারা সবকিছু ভেঙেচুরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চায়। মারধর করলে শিশুরা ভবিষ্যতে আচরণগত সমস্যায় ভোগে, নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, অভিভাবকদের উচিত হবে শিশুদের কথা শোনা, আর সীমা লঙ্ঘন করলে প্রয়োজনে তাকে তার সবচেয়ে পছন্দের জিনিস থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে। শিশুকে শাস্তি প্রদান মারাত্মক অপরাধ। এ ব্যাপারে যে কেউ আদালতে বিচার প্রার্থনা করতে পারেন। শাস্তির ফলে অতিরিক্ত ভয়, আলসার, মাথাব্যথা, অ্যালার্জি, ডিপ্রেশনের মতো রোগ দেখা দিতে পারে।

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে সর্বক্ষেত্রে সাবধানতা জরুরি। শিশু বিশেষজ্ঞরা তাদের মেধাসহ সুকুমার বৃত্তির চর্চা ও বিকাশের ব্যাপারে বহু গবেষণা করে সুপারিশ করেছেন, শারীরিক শাস্তি শিশুর মেধা বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। শিশুদের আচরণ, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, পরম ধৈর্য, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি, আন্তরিকতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে হবে। ভুলত্রুটি সংশোধন এবং অভিভাবক, শিক্ষক, প্রতিবেশীদের যৌথ ভূমিকায় তাদের আগামীর সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

মো. সিদ্দিকুর রহমান: আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম

আপনিও লিখুন

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষকসহ নতুন লেখকদের লেখা প্রকাশ করতে চাই। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আপনারা কী ভাবছেন— তা নিয়ে আমাদের কাছে লেখা পাঠান।
শব্দসংখ্যা ১০০০ থেকে ১২০০।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদকীয় বিভাগ
যুগান্তর
ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯
ইমেইল : editorial.jugantor@gmail.com